প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-৭

(মেজর, মাখন, মজু নামের বালকেরা আজ হতে ষাট বছর আগে গাজীপুরের এক গন্ডগ্রামে বনে বাদারে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক প্রাগৈতিহাসিক কাল। সমাজে মানুষের পাশাপাশি জ্বিন-পরীদেরও অবাধ বিচরণ ছিল। জঙ্গলে বাঘ ছিল, হরিণ ছিল। আর ছিল ডোবা-নালা-বিল-হাওড়ভর্তি অজস্র মাছ। প্রাগৈতিহাসিক সেই সমাজ নগর-সভ্যতার অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে বহুকাল আগে; তবুও হারিয়ে যাওয়া সেই সময় এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায় মনের আকাশে। সেইসব প্রকৃতি-বালকদের রোজনামচার কিছু অংশ স্মৃতিবদ্ধ করার প্রয়াসেই অত্র উপাখ্যানগুলির অবতারণা।)

ক্বোহকাফ শহর থেকে ঢাকা শহর

প্রিভিলেজ ও রেসপনসিবিলিটি বলে দু'টো কথা আছে। শব্দ দু'টোর মাহাত্ম সম্পর্কে ছোট বেলাতেই পূর্ণাংগ ধারণা হয়েছিল আমার । বিষয়টি খুলে বলা দরকার।

এখন আমি স্কুলে যাই। ছোট ওয়ান, বইপুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য - রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা মাত্র। এত কম বইয়ে কারও মন উঠে ? সুতরাং পুরাতন একটা লোকনাথ পঞ্জিকা যোগাড় করেছি, খুব মোটা বই। সেটাও সাথে করে নিয়ে যাই, নিজেকে খুব উঁচুদরের পড়ুয়া বলে মনে হয়। কয়েকদিন যেতে না যেতেই স্কুল সম্পর্কে মোহভংগ হতে শুরু হলো। স্কুলে যাওয়ার প্রিভিলেজটি আয়ত্বে আসার পর দেখা গেল – অসুবিধাও বিস্তর। স্কুলে খালি মনে পড়তো- মাখন, মজু, হবি ওরা সবাই এখন মজা করে গরু রাখছে, 'ক্বাপ' খেলছে কিংবা তুরাগের বুকে ঝাপাচ্ছে। আর আমি কিনা খামোখা 'অজ-অথ-আম-আর' নিয়ে পড়ে আছি।

মাকে বললাম- 'মা, আমি আর স্কুলে যামু না, গরু রাখুম'। আমার স্কুলে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে মা'র মোটেও মাথাব্যাথা ছিল না। পরমানন্দে গরুগুলি নিয়ে চকে যাই। কিন্তু কয়েকদিন পর দেখা গেল এ লাইনেও বিস্তর অসুবিধা । গরুর পেট ভরল কিনা, চাইল্যা পানি খাওয়ানো হলো কিনা, সবগুলো গোয়ালে উঠল কিনা- হাজারো ফ্যাকড়া। প্রিভিলেজ মাত্র একটা, স্কুলের হাত থেকে রেহাই - কিন্তু রেসপনসিবিলিটি বহু। বিকেলবেলা সবাই হালটের মেলায় জড়ো হয়েছে, আমি গোয়াল ঘর গুতোচ্ছি। এর চেয়ে স্কুল অনেক ভাল। সেখানে প্রিভিলেজ কম, রেসপনসিবিলিটিও কম। কী আর করা ? সবকিছু তো আর একসাথে পাওয়া যাবে না।

শ্রাবন মাস, দিনরাত বৃষ্টি। প্যাক-কাদার জন্যে হাটাচলা করা যায় না। মাখন এসে বললো- 'ম্যাজের, দ্যাখ্'।

মাখনা ওর পা'টা আমার দিকে মেলে ধরল, ওর আংগুলের ফাকে শাদা দগদগে ঘা, আমরা বলি 'পাকলা'। কাদার মধ্যে হাটাচলা করলে পায়ে পাকলা পড়ে।

মাখনের সগর্ব হাসি দেখে মনটা ছোট হয়ে গেল। মাখন আমার ছয় মাসের ছোট। ও হাল বাইতে পারে, মই দিতে পারে, এমনকি পাকলা পর্য্যন্ত পড়ে গেছে ! আর আমি ? এই ছ্যাতার স্কুলে যেয়ে আমার কী লাভ হলো ? আজ মাখন কোথায় আর আমি কোথায় ?

মাখন একটা ছেড়া ন্যাকড়া দিয়ে ঘায়ের মধ্যে কেরুসিন তেল লাগাচ্ছিল। আমি বললাম- 'জ্বলে'?

ও মাথা নেড়ে বলল- 'হ, একটু একটু জ্বলে, তয় খুব আরাম লাগে'।

- 'আমার পাকলা পড়ে না ক্যান্ ক' দেহি ? এত প্যাক কাদায় ঘুরি কিচ্ছু অয় না'।

- 'এমনে অইব না। গোয়াল ঘরের পিছে গোবরওয়ালা প্যাক আছে তার উপর দিয়া হাটবি, দেখবি দুই দিনেই পাকলা পইরা গেছে'।

আগামি কাল শাইল ধান রোয়ার জন্যে কামলাদের নিয়ে জলি চাচা পাঠাতা যাবে। পাঠাতা বহু দুর, বাড়ী থেকে ছয় সাত মাইল। সেখানে আমাদের শাইল জমি আছে, আগামীকালই প্রথম ধান লাগানোর দিন। নৌকা ভরে হালি সাজানো হয়েছে, বাড়ীতে উৎসবের আমেজ। আমি বায়না ধরলাম- 'আমিও পাঠাতা যামু'।

মা ধমকে উঠলেন- 'ইশ্ কী আমার কামলারে, আমি পাঠাতা যামু। সারাদিনের ফের, আইতে আইতে রাইত দুপুর অইব'।

- 'না আমি যামুই, না নিলে ভাত খামু না'।
- 'না খাইলি, ভাত না খাইলে কার কি অইব'?

মাখনের উন্নতি দেখে এমনিতেই বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল, মা'র কথায় তা আরও উস্কে উঠল। বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়লাম। ধনুর্ভাংগা পণ, মরে গেলেও খাব না। মা অনেক সাধাসাধি করলেন, টুলু বুজি পর্য্যন্ত হার মেনে গেল। অবশেষে জলি চাচা বললেন– 'ঠিক আছে ভাত খা, নিমুনে'।
আমি মাথা তুলে বললাম– 'ঠিক তো, আমি কিন্তু যামুই'।

পাইকপাড়া পাঠাতা বাড়ী থেকে বহুদুর। মইরকা বিল, আউলা বিল, গজাইরা বাইদ প্রভৃতি অগনিত বিল হাওর পাড়ি দিয়ে তবে সেখানে যেতে হয়। ভরা বর্ষায় বিলগুলি কানায় কানায় পুর্ণ, একটি ছোট ডিংগী নৌকায় আমাদের যাত্রা। বাইদগুলি একটু চাপা, দুই ধারে শাল-গজারির নিবিড় বন। উচু লালমাটির টিলার মাঝে মাঝে কিছু নীচু জায়গা আছে যেগুলিকে বাইদ বা ঘুনি বলে। এই সমস্ত বাইদ বা ঘুনিতে আষাঢ়-শ্রাবন মাসে কালিজিরা, চিনিগুড়া, মালতি প্রভৃতি ধান লাগানো হয়। পাঠাতার রাকে আমাদের যে জমিটি তার নাম জবানির ঘুনি। জবানির ঘুনিতে যখন এসে নৌকা থামল তখন বেলা বেশ উপরে উঠে গেছে।
চারিদিকে শুধু জংগল আর জংগল, বাড়ীঘরের কোন নামগন্ধও নাই। নিঃশব্দ। কানে তালা ধরে যায়। খেতের পাশে গজারি গাছগুলি সারি বেঁধে দাড়িয়ে আছে, তলা পরিষ্কার। এই জংগলে বাঘ আছে, হরিণ আছে, বাঁনর আছে – আরও কত কি আছে !
জলি চাচা কামলাদের সংগে ধান লাগাচ্ছিলেন। আমি বললাম– 'এই জংগলে বাঘ আছে'?
- 'আছে, তয় অনেক ভিতরে। বাঘেরা সচারাচর মানুষ-ম্যালে আহে না'।
- 'ক্যান্, আহে না ক্যান্'?
- 'মাইনষেরে সক্কলেই ডরায়, বাঘেও ডরায়'।
শুনে খুব খুশী হই। আমরা খুব শক্তিশালী, বাঘেও ডরায়। খুশী মনে জংগলে ফিরে যাই আবার, গজারি পাতা দিয়ে বাঁশি বানাতে চেষ্টা করি। মাখন থাকলে বেশ হতো, অনেকদুর যাওয়া যেতো, একা ভয় লাগে।
একটা শব্দ শুনে উৎকর্ণ হই। মনে হলো যেন জংগলের মধ্যে কিছু চলাফেরা করছে। পাতার খসখস আওয়াজ হচ্ছে। ভয় পেয়ে দৌড়ে চাচার কাছে চলে আসি।
- 'কি অইছে, দৌড়াস ক্যান ? ইস্, দেখতো পাও দিয়া হালিগুলির কী দশা করলি'।
আমার পা লেগে সদ্য-রোপা কিছু হালি উপড়ে গেছে।
আমি বললাম– 'জংগলের ভিতর কী যেন নড়াচড়া করছে, বাঘ অইবার পারে'।
- 'হ, তর লাইগা বাঘ আইয়া বইয়া রইছে, গরুটরু অইব কারও। যা দেহি, তামুক ধরাইয়া আন্'।
খেতের একপাশে তামাক ধরানোর সরঞ্জাম। একটা 'আইলসা' (ঘুটে ও তুষ দিয়ে আগুন সংরক্ষনের মাটির পাত্র), একটা হুক্কা ও তামাক। আমি হুকা ধরাতে ওস্তাদ, টান মেরে ধুয়াও বের করতে পারি। তবে এখন সেদিকে যেতে ভয় লাগছিল, যুদি বাঘটাগ আহে।
চাচা বিরক্ত স্বরে বললেন– 'তরা হুদাহুদি ভয় পাস। বাঘ দিনে বাইর অয় নাকি, চল্ দেহি..'।
আমার ভয় ভাঙ্গানোর জন্যে চাচা জংগলের ভেতর ঢুকলেন। গজারি গাছের নীচ দিয়ে অনেক দুর দেখা যায়। মাঝে মাঝে নানাপ্রকার লতাগুল্ম মিলে ঝোপের সৃষ্টি করেছে যার ভেতর দিয়ে চলাচল করা অসাধ্য। একটা ঝোপ পার হতেই দেখা গেল দু'জন মেয়ে উবু হয়ে বসে কি যেন করছে। আমি বেশ অবাক হই, এই 'অইরান' জংগলে মানুষ, তাও আবার মাইয়া মানুষ !
আমাদের দেখে মেয়ে দু'টি উঠে দাড়াল। বড় মেয়েটি ফুলমতি বু'র সমান। তবে মোটাসোটা, ফুলমতি বু'র মতো ছিমছাম না। নাক বোঁচা, ছোট ছোট চোখ। পরণের কাপড় ছেড়াখোড়া, শরীরের অনেক অংশই উদোম রয়ে গেছে। ছোট মেয়েটি একেবারেই ন্যাংটা, কোমরের কাছে সামান্য এক টুকড়া নেংটি। এরা খুব গরীব তো, আমাগো গায়ের সিধু ফকিরনির চেয়েও গরীব। সিধু ফকিরনিও এর চেয়ে ভাল কাপড়চোপড় পরে।
জলি চাচা বললেন– 'এই ছেমড়ি, তগো বাড়ী কই ? জংগলে কী করস'?
বড় মেয়েটি কলকল করে কি যেন বলল তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। শুধু ঢুলিগড়া শব্দটি কানে যেন মধুবর্ষণ করলো। ঢুলিগড়া জংগলের এক বিখ্যাত নাম, কোঁচ ও মান্দাই সম্প্রদায়ের বাস। কোঁচ ও মান্দাইরা এক আজব জাত, মুসলমান না। এরা জংগলে থাকে, শুয়র খায়, মদ খায়, পোকামাকড়

খায়- এমনকি কুকুরও নাকি খায়। জলজ্যান্ত দু'টি মান্দাই মেয়ে আমার সামনে, ভাবা যায় ! মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, মাখনদের কাছে বলার মতো একটা বিষয় জুটে গেছে। মাখনার পায়ে যতোই পাকলা পড়ুক, সে এখনও পাঠাতা আসে নাই, কোঁচ মান্দাই দেখে নাই।

জলি চাচা মান্দাই ভাষা বুঝেন, বলতেও পারেন। অচিরেই মেয়েটির সাথে খাতির জমিয়ে ফেললেন। মেয়ে দু'টি জংগল থেকে আলুর মতো কি যেন তুলছিল- নাম কুন্দাইয়া। বেশ ক'টি যোগাড় করেছে তারা। আমাকে অবাক করে চাচা মেয়ে দু'টিকে দুপুরে আমাদের সাথে ভাত খেতে আমন্ত্রণ করে বসলেন। ছিঃ ছিঃ. মদ-শুয়োর খাওয়া লোক আমাদের সাথে ভাত খাবে ! চাচার এ কেমন আক্কেল ? মেয়েটিও সাথে সাথে রাজী, মনে হয় জীবনেও ভাত চোখে দেখে নাই।

বাড়ী হতে বড় বড় দুটি ডেকচিতে গরম ভাত ও কুমড়া ভাজি আনা হয়েছে- দুপুরের খাবার। কিন্তু পানি, পানি কোথায় ? আমি বললাম- 'চাচা, ভুল অইয়া গেছে, পানি আন নাই। অহন পানি পাইবা কই'?

আমার কথায় মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল যেন খুব মজার কথা শুনছে। এত হাসার কি আছে বুঝে উঠতে পারলাম না। আশেপাশে বাড়ীঘর নাই যেখান থেকে পানি সংগ্রহ করা যায়। বিলের পানি সাংঘাতিক ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত। তা'হলে কি বিলের পানিই খাওয়া হবে ?

নৌকার পালগুড়ার নীচ হতে একটি কলসি বের করলেন চাচা, মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে মান্দাই ভাষায় কী যেন বললেন। মেয়েটি কলসিটি হাতে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল- 'আছ, পানি লইয়া আছি'।

বাহ্, এ তো আমাগো ভাষায়ও দিব্বী কথা বলতে পারে! পানি কোথা থেকে আনবে, নিশ্চয়ই আশে পাশে গ্রাম আছে। খুশী মনে পিছু নেই আমি।

ছোট ছোট আইল করে কৃষকরা খেত বানিয়েছে, প্রায় প্রতি খেতেই ধানের চারা লাগানো হয়েছে। নীচু খেতগুলির এক প্রান্ত এসে বনের সাথে মিশে গেছে। সেখান থেকে মাটি ক্রমশঃ উচু হয়ে টিলার দিকে উঠে গেছে। চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম, নীচু বাইদ যেখানটায় উচু টিলার সাথে মিশেছে সেই সংযোগস্থলে মাঝে মাঝে তিরতির করে পানি বেরুচ্ছে। ব্যাপারটা কি, বৃষ্টিবাদলা কিচ্ছু নাই পানি আসে কোত্থেকে ?

বেশ কিছুদুর যাওয়ার পর ঘুনি যেখানে শেষ হয়ে নাবাল বন শুরু হয়েছে সেখানে এসে থামল মেয়েটি। মেয়েটির দৃষ্টি অনুসরণ করতেই এক অবাক দৃশ্যে চোখ আটকে গেল আমার। বাইদ ও টিলার সংযোগস্থলে এক জায়গায় কলকল করে পানি বেরুচ্ছে, কাকচক্ষু টলটলে পানি। পারুল বুজির বাংলা বইতে একটা সুন্দর কবিতা আছে- 'ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা'। শুনতে শুনতেই কবিতাটি মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। পাঠাতার গড়ের এক নিভৃত কন্দরে সেইরকম একটি ঝর্ণা দেখতে পেয়ে আনন্দে আটখানা আমি। দৌড়ে ঝর্ণার কাছাকাছি যেয়ে দাড়ালাম। মেয়েটি বলল- 'পানি খাইবা'?

শ্রাবন মাসের প্রচন্ড রোদ, একটু বাতাস নাই, গাছের পাতাও নড়ে না। খুবই তিয়াস লেগেছিল আমার, কিন্তু পানি খাই কীভাবে?

মেয়েটি উবু হয়ে বসে দুই হাত জোড়া করে চুকচুক করে পানি খেতে থাকল। ওর নকল করতে যেয়ে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যায় আমার। শুধু যে কাপড়চোপড় ভিজে একসা তাই নয়, নাকের ভেতর পানি ঢুকে হাঁচতে হাঁচতে দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার যোগার। পাত্র ছাড়া শুধু মুখ লাগিয়ে পানি খাওয়া যে এত কষ্টের আগে জানা ছিল না।

আমার দুর্দশা দেখে মেয়েটি বলল- 'দাড়াও, ব্যবস্থা করতাছি'।

জংগল থেকে বড় দেখে একটি পাতা নিয়ে আসল মেয়েটি। পাতাটি বেঁকিয়ে সুন্দর ঠোঙ্গা বানাল সে। সেই ঠোঙ্গায় যখন পানি ভরল- একবিন্দু পানি পড়ছে না ! এক হাতে আমার মাথা ধরে আস্তে আস্তে পানি খাওয়াতে থাকল আমাকে। পানি খুব স্বাদের, মিঠা মিঠা। মাখনা, মজু, হবি ওরা কেউ ঝর্ণার পানি খায় নাই।

আমার মুখ বুক সব ভিজে গেছে। পানি খাওয়ানো শেষ হলে ছেড়া আঁচল দিয়েই আমার মুখ যত্নের সাথে মুছিয়ে দিল মেয়েটি। আরাম ! পৃথিবীর পথেপ্রান্তরে এমনকি বনে জংগলেও এত মা-বোন ছড়িয়ে আছে ! ফুলমতি বু যখন আদর করে চুমা খান, তখন যেরূপ আরামে চোখ বুজে আসে- - এই

কুকুর-শুয়োর খাওয়া মান্দাই মেয়েটির বেলায়ও ঠিক তাই হচ্ছে ! বিন্দুমাত্র ঘেন্না হচ্ছে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার তো !

ভরা কলসিটি কাঁখে না নিয়ে মাথায় নিল সে। আমি বললাম- 'হেই ! তুমি কলসি মাথায় নিলা ক্যান্, মাইয়া মাইনষে কুনদিন মাথায় নেয় ? আমাগো মা কলসি কাঁখে নেয়'।

মেয়েটি হাসিমুখে বলল- 'তোমার মাইজি খুব ছুন্দর তাই না'? আমি গর্বভরে বললাম- 'সুন্দরই তো। আমার মা পাড়ার বেবাকের থেইকা সুন্দর। পাড়ার হগ্গলে আমার মা'র কথা হুনে'। মেয়েটি বলল- 'আমারে তোমাগো বাড়ী লইয়া যাইবা'? এবার আমার মুখে কোন কথা জোগায় না। নিলে খুব ভাল হত, কিন্তু জলি চাচাকে সে কথা আমি বলি কীভাবে ? লজ্জার কথা, অথচ মনে খুব ইচ্ছা মেয়েটি আমাদের সাথে যায়। কিছুদুর এসে দাড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। একটা ঝোপের দিকে তাঁকিয়ে বলল- 'বংকইর খাইবা'?

আনই ও বংকইর খুবই সুস্বাদু জংলা ফল। ছোট ছোট কাটাওয়ালা গাছে এইগুলি ফলে। তবে এখন তো আনই বংকইরের সিজন না।

মেয়েটি বলল- 'এইগুলা আকাইলা বংকইর, খাইতে খুব স্বাদ'। কাটা এড়িয়ে অনেকগুলি বংকইর তুলল মেয়েটি, এক কোচড়। কালো কালো ফলগুলি পেকে টুবটুবা হয়ে আছে। মহা আনন্দে বংকইর খেতে থাকলাম আমি।

মেয়ে বলল- 'আনই বংকইরের ঝোপ খুব খারাপ আছে। বড় ছিয়াল এখানে ছুপাইয়া থাকে'। বাঘকে জংগলের লোকেরা শিয়াল বলে, বড় শিয়াল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম- 'তুমি বাঘ দেখছ'?

- 'কত্তো'। মেয়েটি ঠোট উল্টিয়ে বলল। 'গত হপ্তায়ও ছিদাম বংশীর বলদটা বাঘে মারল'।
- 'এহানে বাঘ নাই'?
- 'উহু, এত নামায় বাঘ আছে না। তবে ফাগুন-চোত মাসে যখন পানি ছুকাইয়া যায়, তখন এদিকে বাঘ নাইমা আছে'।

স্বস্তির সাথে একটু নিরাশও হলাম। জংগলে এসে বাঘ না দেখে ফিরে যাওয়া- বড়োই আনসাকসেসফুল মিশন। মজু-মাখনদের কাছে মুখ থাকবে না।

সন্ধার বেশ আগেই রওনা হলাম আমরা। ফিরতে রাত দুপুর হয়ে যাবে। মনটা ভারাক্রান্ত। একদিনের পরিচিত একটা মুখের জন্যে মন এত উতলা হয় ? মেয়ে দু'টি আমাদের সাথে ভাত খেয়েছে, থালাগুলি ধুয়ে দিয়েছে, কামলাদের তামাক সেজে দিয়েছে। জোর করে কয়েকটা কুন্দাইয়া নৌকায় তুলে দিযেছে, এগুলি দিয়ে নাকি চমৎকার শালুন হয়। যাত্রার আগে আমাকে কোলে নিয়ে আদর করল মেয়েটি, চুমা দিল। মুহূর্তেই টুলু বুজির কথা মনে পড়ে গেল আমার। টুলু বুজির বিয়ে হয়ে গেছে ভাটিপাড়া, আর আমাদের সাথে থাকবে না। জামাই বাড়ী যাওয়ার আগে প্রায়ই পালায় টুলু বুজি, বড় ঘরের পাটের পিলের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। সেখান থেকে ছিড়ে এনে নিষ্ঠুরভাবে জামাই বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। টুলু বুজির ভাটিপাড়া যাওয়ার সময় প্রতিবারই যে অসহ্য কষ্ট হয় আমার, অপরিচিতা একটি মান্দাই মেয়ের জন্যেও সেই একই কষ্ট বোধ করলাম আমি। পৃথিবীর সবখানে বড়োই দুঃখ।

অনেক রাত হয়েছে। বিশাল আউলা বিলের মাঝ দিয়ে আমাদের ছোট্ট নৌকাটি তিরতির করে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে অগনিত তারা ঝিকমিক করছে। দিগন্তজোড়া আঁধারসমুদ্রে আমাদের নৌকাটি কোন্ নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা করেছে যেন। যদি আমরা হারিয়ে যাই, যদি কখনও আর খালপাড় গ্রামে না পোছুতে পারি। এক আদিম ভয়ের সাথে মায়ের চেহারা মনের পটে ভেসে উঠল। আমার স্নেহময়ী মা, অত্যাচারিনী মা - কোথায় কোন সুদুরে আমার জন্যে জেগে বসে আছে। মার জন্যে মন কেমন করে উঠল আমার, মাকে ছেড়ে দুরে থাকার কি কষ্ট এই প্রথমবার তা উপলব্ধি করলাম।

পুবদিকে খুব উচুতে তারার মতো কী যেন একটা জ্বলছে। প্রথমে ভেবেছিলাম তারা, কিছুক্ষন পরেই ভুল ভাঙল। জিনিষটা তারার চেয়ে অনেক বড় - চাচাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন- 'ওডা লাখের বাত্তি। ফালু সরকার লাখের বাত্তি জ্বালাইছে'।

- 'লাখের বাত্তি কী চাচা'?

সমুদ্রের পাড়ে নাবিকদের জন্যে বাতিঘরে বাতি জ্বালানো হয় শুনেছি, জেলেপাড়ার জেলেরা আকাশবাতি জ্বালিয়ে রাখে তাও দেখেছি, কিন্তু লাখের বাতির কথা কখনও শুনি নাই। চাচা বললেন- কোন লোক যদি একলাখ টাকার মালিক হয় তবে তাকে খুব উচু কোন গাছের উপর রাতের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তালেপাবাদ পরগণায় গোবিন্দপুরের ফালু সরকারই প্রথম লাখপতি, তাই তিনি লাখের বাতি জ্বালিয়েছেন। ভাওয়াল পরগণায় আরেকজন লাখপতি আছেন, তার নাম মাদবর হাজি। তিনি এতই ধনী যে তার নাকি ৫২ মণ শুধু বীজধানই লাগে। তিনি একবার উড়োজাহাজ কিনতে 'কইলকাত্তা' গিয়েছিলেন সে গল্পও শুনালেন চাচা। রূপকথার সিন্দবাদ নাবিকদের মতো ধনী এইসব মহাপুরুষদের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। লাখ টাকা না জানি কত তোড়া টাকা।

পাঠাতা অভিযানের গল্প বেশ কিছুদিন চলল। মজ্জেম-শামসু-মাখনরা এতই বিশ্বাসপ্রবন যে দিনে দুপুরে বাঘের ডাক তাদের কাছে মোটেও অসম্ভব বলে মনে হলো না। পরীর মতো সুন্দর একজন মান্দাই মেয়েকে ছেড়ে আসতে আমার যে কী কষ্ট হয়েছিল সেই কথা শুনে তাদের চোখও ছলছল করে উঠেছিল।
পারুল বুজি মাকে বললেন- 'মা, ভাবী কবে আইব'?
মা ঢেকিতে গুড়ি কুটছিলেন। জবাব দিলেন- 'শীগগীরই আইব- এই সপ্তায়ই'।
আমি অবাক হয়ে বললাম- 'এ্যাই গেদি, ভাবী কেডারে, কোন ভাবী আইব'?
পারুল বুজি হৃষ্টমুখে বললেন- 'এল্লা তুই জানস না ! ঢাকা থেইকা ওয়াজুদ্দি ভাইর বউ আইব আমাগো বাড়ীত। কতকিছু লইয়া আইব, রসগোল্লা লজেন্স আরও কত কী। ভাবী আমাগো মতো মানুষ না, কুমিল্লা শহরের মাইয়া। দিনরাত চা খায়। মা চা আনাইছে, গুড়ি কুটতাছে। পশ্চিম বাড়ীর মামানি আইসা চা বানানো শিখাইয়া দিয়া যাইব মায়েরে। মা নুন দিয়া চা বানায়, চায়ে কেউ নুন দেয় ! মা চা বানাইতেও জানে না'।
এ তো বড় সাংঘাতিক খবর ! ওয়াজুদ্দি ভাই এলাকার কিংবদন্তীর পুরুষ। মাইটাখোলা গ্রামের ময়জুদ্দি সরকারের ছেলে। ময়জুদ্দি সরকার বাবার ফুফাত ভাই। বড় ছেলে ওয়াজুদ্দিনকে তিনি ঢাকার এক হোমরা-চোমরা সাহেবের হাতে সপে দিয়েছিলেন। সাহেবের কৃপায় ওয়াজুদ্দি ভাই এখন মস্ত লোক, ঢাকায় এক অফিসের পিয়ন। পোষ্টাপিসের পিয়ন না, সরকারি আপিসের পিয়ন সাব। প্রচুর উপরি। উপরি কী জিনিষ তা তখনও বুঝি নাই, তবে তা যে সোনাদানার চেয়েও মুল্যবান কোনকিছু তাতে কোন সন্দেহ নাই। ওয়াজুদ্দি ভাইয়ের ঢাকা শহরে বাড়ী আছে, দশ গাঁয়ের লোক এক ডাকে তাকে চিনে। সেই কীর্তিমান পুরুষের বউ আমাগো বাড়ীতে আসব- এর চেয়ে খুশীর খবর আর কি আছে ?
খবরটা নিয়ে তখনই লালমিয়ার কাছে দৌড়ে যাই। সমবয়েসী হলেও লালমিয়া আমার গার্জিয়ানতুল্য। ও বড়লোকের ছেলে, এই বয়েসেই জুতা পায়ে চলাফেরা করে। আমার পেছনে লালমিয়া এত পয়সা খরচ করেছে যে কোন সুসংবাদ ওর সাথে ভাগাভাগি না করলে সেটা চরম অকৃতজ্ঞতা হবে।
বিবরণ শুনে লালমিয়া বলল- 'তর ভাবী মেমসাব'?
- 'মেমসাব আবার কী, তারা কী করে'?
- 'মেমসাব চিনস না বোকা ! ঢাকা শহরে মাইয়ারা সব মেমসাব। তারা খুব সুন্দর অয়, এক্কেবারে হুরপরীর মতন। মেমসাবরা রাস্তায় খারাইয়া থাকে, পুরুষ মাইনষের লগে হাত ধইরা চলে, হাসাহাসি করে'।

আমি বলি- 'আমাগো ভাবীও নিশ্চয়ই মেমসাব, কুমিল্লার মাইয়া। সোজা কথা না, হেই কুমিল্লার। ঢাকার থেইকা বেশী দুর'।
অবশেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সেই দিনটি এলো। এক শুভ সন্ধায় জেহার সরকার তার কীর্তিমান ভ্রাতঃষ্পুত্র ওয়াজুদ্দিন ও তার মেমসাব বউ নিয়ে বাড়ীতে পদার্পণ করলেন।
বাড়ীতে বউঝি'দের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল, কিন্তু আমি খুবই নিরাশ হলাম। ওয়াজুদ্দি ভাইকে মোটেও পছন্দ হলো না আমার, একেবারেই সাদামাটা মানুষ। উত্তর পাড়ার মনসুর মামার মতো, ছোটখাট গোলগাল। সাহেব মানুষ লুংগী পড়ে, সবার সাথেই হেসে কথা কয়, ইংরেজী-মিংরেজী কিচ্ছু বলে না - এ আবার কেমন সাহেব ? আমাদের কল্পনা এতটা নীচে নামে নাই। ভাবীও আমাদের আশা পুরণে ব্যর্থ হলো। নেহায়েতই সাধারণ একটি মেয়ে, টুলুবুজি পারুলবুজিরা বরং

ভাবীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। মেমসাহেবের রূপ দেখে নিদারুন আশাভঙ্গ হলো, তবে কাঞ্চনী আমাদের মান কিছুটা রক্ষা করেছিল সেবার। কাঞ্চনী ভাবীর সাথে এসেছে, পারুল বুজির সমবয়েসী একটা মেয়ে। জানা গেল, কাঞ্চনী ভাবীর 'বান্দী'। যাক্, আমাগো ভাবীর একজন বান্দী আছে। সাধারণ মানুষ আর যাই হোক বান্দী রাখতে পারে না।

ভাবী ঢাকা শহর থেকে এস্পেশাল এক ধরণের মিঠাই নিয়ে এসেছিলেন। লাল-নীল কাগজে প্যাক করা ছোট ছোট মিঠাই, মুখে দিলে আস্তে আস্তে গলে গিয়ে দুধের সরের স্বাদ ছড়ায়। নাম টফি। কয়েকটি টফি পকেটে নিয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বন্ধুবান্ধবদের দেখালাম। এমন উন্নতমানের মিষ্টি খালপাড় গ্রামের কেউ চোখে দেখে নাই। কালিয়াকৈর বাজারের ক্ষিরোদ ঘোষের মিষ্টি দেশবিখ্যাত, তবে টফির তুলনায় তা যে কিছুই না- বিশ্বনিন্দুক হবি পর্য্যন্ত তা স্বীকার করল। হবি স্বল্পবাক মানুষ, কখনও কোনকিছুর প্রশংসা করে না। আমার কাছ থেকে একটা টফি চেয়ে নিয়ে খেয়ে বলল- 'খুব মিঠা রে ম্যাজের, বেহেশতি ফলের লাহান'।

- 'রসগোল্লার চাইতেও মিঠা, তাই না'? আমি বললাম।
- 'ধুৎ, কীসের সাথে কি, পান্তাভাতে ঘি। এইগুলা অইল ঢাকা শহরের মিঠাই, স্বাদই আলাদা'। হবির মন্তব্য।

সুতরাং ভাবীর মন যোগাতে লেগে যাই, অহর্নিশি তার পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকি। ঢাকা শহর থেকে এসেছে, মেহমানদের যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় তা দেখা আমাদের কর্তব্য। অবস্থা এমন যে কাঞ্চনীও যদি কোন কাজ করতে যায় চোখ খরখর করে। ও কেন করবে, কাজগুলি গেদীবুজি করলেও তো পারে। একদিন ভাবী বললেন- 'তোমার নাম তো মেজবাহ, সুন্দর নাম। সকলে তোমারে ম্যাজের ম্যাজের করে কেন'?

কী আর জবাব দেই, নাম বিকৃত করার চেয়ে খারাপ কাজ পৃথিবীতে আর নাই। তিনি আবার বললেন- 'তুমি কোন ক্লাশে পড়'?

- 'এইবার বড় ওয়ানে উঠলাম'। কোনমতে জবাব দেই। আমি লম্বায় বেশী, অন্ততপক্ষে থিরিতে পড়া উচিৎ ছিল আমার। ওয়ানের মতো তুচ্ছ ক্লাশে পড়ার জন্যে এই প্রথম লজ্জা হতে লাগল।
- 'আমি সাতার জানি, গুড্ডিও বানাইতে পারি'।

আমার কথায় হেসে ফেলেন ভাবী, বলেন- 'তাই ? খুব কাজের ছেলে তো তুমি। আমার সাথে ঢাকা যাইবা'?

এ বলে কি ? আমারে নিয়া ঢাকা যেতে চায় ! চন্দ্রসূর্য্য কোনদিকে উঠেছে আজ ?

আগ্রহের সুরে বলি- 'আমারে নিবেন'?

ভাবী আমার মাথায় হাত রেখে বলেন- 'নিশ্চয়ই নিমু। তুমি আমারে কত যত্ন করছ, বরই খাওয়াইছ, গেন্ডারি খাওয়াইছ। তোমারে নিমু না তো কারে নিমু'।

আমার আসন্ন ঢাকা সফরের কথা অচিরেই ঘনিষ্ট মহলে প্রচার হয়ে গেল। এত বড় ঘটনা খালপাড় গ্রামের বালকমহলে কখনও ঘটে নাই।

মাখনা কিছুদিন আগে আমার দল ছেড়ে মুন্নাফের দলে যোগ দিয়েছিল। সে এসে বলল- 'তুই নাকি ঢাকা যাবি'?

আমি বললাম- 'হ যামুই তো'।

- 'আর আবি না'।
- 'না, ভাবী কইছে আমারে ঢাকার স্কুলে ভর্তি কইরা দিব, জুতা মোজা কিনা দিব'।

কথাটা মিথ্যা, ভাবী এধরণের কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তবে দলত্যাগী লোকের সাথে মিথ্যা বলায় পাপ নাই। এইবার মাখনা বুঝবে, আমার দল ছেড়ে মুন্নাফের দলে যোগ দিয়ে সে কী ভুলটাই না করেছে। আমি ঢাকা যেয়ে বাসে চড়ব, ইলেকটারি বাতি দেখব, রেলগাড়ি দেখব। মুন্নাফের সে মুরোদ আছে ? জীবনেও ঢাকা যেতে পারবে না সে।

সেদিন পারুল বুজি ভাবীকে বলল- 'ভাবী, আপনে নাকি ক্যানিসেরে ঢাকা নিয়া যাইবেন'?

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে আসল নাম ছাড়াও আমাদের গোপন কিছু অপবাদমূলক নাম আছে যা সাধারণতঃ ঝগড়ার সময় ব্যবহৃত হয়। এই নিয়মে আমার নাম ক্যানিস, মজ্জেম ঢ্যাঙ্গা, মাখন চেঙ্গু

মিয়া, বাচ্চু ভাই হান্দার নামে বিখ্যাত। আমার নামটিই সবচেয়ে সেন্সিটিভ, কারণ শত্রুরা এই নামে একটা কবিতাও রচনা করে ফেলেছে-
“পশ্চিমা মাউরারা চলে
কুটম্যাল বাক্স বুকের তলে
ক্যানিস হে”।
‘ক্যা-নি-স-হে’ শব্দটা উচ্চারণ করার সময় শত্রুরা গলা খাঁদে নামিয়ে মাথায় এমন জোরে ঝাকি মারে যে তা সরাসরি আমার বুকে যেয়ে আঘাত করে। পারুল বুজি আমার শত্রু, তাই বলে ভাবীর কাছে আমার গোপন নাম ফাস করে দেবে - এতটা হৃদয়হীনতা আশা করি নাই।
স্থানকাল ভুলে চেচিয়ে উঠি- ‘যামুই তো ঢাকায়, তর কীরে জালার বউ’।
জালা ওরফে জালালউদ্দিন পশ্চিম বাড়ীর এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী। থপথপিয়ে হাটে, পায়ে গোদ আছে। পারুল বুজি মুহূর্তের মধ্যে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আমিই বা কম কীসে, দুই ভাইবোনে একে অপরের চুল খামচি মেরে ধরে আছি, ছাড়াছাড়ি নাই। চীৎকার ও হৈচৈ শুনে অবশেষে মা এসে দু’জনকে আলাদা করলেন।
বহু চড়াই উৎড়াই আশা-নিরাশা অতিক্রম করে শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত নস্যাৎ করে আমার ঢাকা যাওয়ার প্রস্তাবটিকে বাঁচিয়ে রাখা গেল। আর চিন্তা নাই, কালই আমরা ঢাকা রওনা হয়ে যাব। মা কাছে টেনে নিয়ে বললেন- ‘আমারে ছাইড়া থাকতে পারবি’?
ঢাকা যাওযার জন্যে শুধু মাকে কেন, সবকিছু ছাড়তে পারি। কিন্তু মা’র মুখের উপর সে কথা বলা যায় না। বলি- ‘মোটে সাতদিন, তারপর তো আইয়াই পরুম মা’।

- ‘ঠিক আছে যাও। রাইতে ঘুমানোর আগে ভাল কইরা পেশাব কইরা শুইয়ো। মনে থাকবে তো’?
- খুব মনে থাকব, ভুলুম না। তুমি আবার ভাবীরে কইয়া দিও না মা’।

অবশেষে আমাদের যাত্রার দিন এলো। একটি বড় ঘাসি নৌকায় আমাদের যাত্রা, মাল্লা তিনজন। ছৈয়ের ভেতর দুইদুইটা পরকশ (প্রকোষ্ঠ), ভেতরের পরকশে ভাবী ও কাঞ্চনী, বাইরের পরকশে বাবা। ভাবীকে ঢাকায় রেখে বাবার সাথেই আবার ফিরে আসব।
তুরাগ নদী বেয়ে আমাদের নৌকা চলছে। দু’দিনের রাস্তা, আঁকাবাঁকা নদীপথে কত গ্রাম কত বন্দর পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। চা’বাগান, ভাওয়াল মির্জাপুর, কড্ডা, কাশিপুর, বিরুলিয়া প্রভৃতি হাজারো ঐতিহাসিক স্থান আমার চোখের উপর দিয়ে পার হবে, তারপর আমরা বুড়িগঙ্গায় পড়ব। ওহ্‌, উত্তেজনায় ছৈয়ের উপর উঠে বসি।
বাবা বেরসিকের মতো ধমকে উঠলেন- ‘নাম্‌, নীচে নাইমা বস্‌, পইড়া যাবি’।
আমি গো ধরে বলি- ‘পড়ুম না বাবা, শক্ত কইরা ধরছি’। শক্ত করে মাস্তুল চেপে ধরে বসি আমি। নদীর পাড়ে হাজারো বাড়ীঘর, গাছপালা, বিচিত্র মানুষজন ছায়ার মতো আমাদের চোখের উপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। একপাল গরু নিয়ে রাখাল নদীতে নামল, সে এখন গরুগুলির গা ধুইয়ে দেবে। মেয়েরা কলসি কাঁখে ঘাটে আসছে- যাচ্ছে। বিরাট মহাজনী নৌকা পাটে বোঝাই হয়ে রাজসিক চালে চলছে। তাদের গন্তব্য সুদুর নারায়নগঞ্জ। নিত্যদিনের দেখা দৃশ্যগুলিই নুতন ব্যঞ্জনা নিয়ে সামনে হাজির হচ্ছে, এসব ছেড়ে কি ছৈয়ের ভেতর বসে থাকা যায় ?
দুরে একটা গ্রাম, গ্রামের গাছগাছালিরর মাথা ছাপিয়ে উঁচু দু’টি চুড়া উঁকি মারছে। মসজিদের গম্বুজের মতো না, ও দু’টো কী ?
বাবা বললেন- ‘ওগুলা মটুক, হিন্দুরা মড়া পোড়ায়’।

- ‘মড়া পোড়ানোর জন্য দালান লাগে ! আমাগো গায়ে তো গাঙের পাড়েই মড়া পোড়ায় হিন্দুরা’?
- ‘আমাগো গাঁয় জেলে নমশূদ্ররা থাকে, ছোট জাত। বামন কায়েতরা উঁচু জাত, তাগো মড়া পোড়ানোর জন্য শ্মশান ঘাট লাগে’।

মাঝে মাঝে নদীতে বিরাট বিরাট বাঁশ গেড়ে তেকোনা জাল ফেলেছে জেলেরা, একটা উঁচু বাঁশে একজন লোক বকের মতো দাড়িয়ে আছে। জাল টানবে।
বাবা বললেন- ‘সামুদ্দি, সামনের বেহালে নাও রাখবি। দেখি মাছ-টাছ কিছু পাওয়া যায় কিনা’।
আমি বললাম - ‘মাছ দিয়া কী করবা বাবা’?

- ‘মাছ দিয়া মাইনষে কী করে, ভাত খাওন লাগব না’?

আশ্চর্য্য কথা, নৌকার মধ্যে বাড়ীর মতো রান্নাবান্না, মাছ কূটা !

একটা বেহালে নৌকা ভিড়িয়ে মাছ কেনা হলো - রায়েক মাছ ও টাটকিনি মাছ।

একজন মাল্লা বলল- ‘রায়েকগুলা দেখছেননি সরকার সাব, প্যাট এক্কেরে লাল টুকটুকা। খুব তেল অইছে, ভাজি করলে যা লাগব না’।

বাবা বললেন- ‘সামনেই মির্জাপুর বাজার। নাও ভিড়াইয়া তেল নুন সব কিনা নে। শুকনা মরিচ নিবি, মুচমুচা মরিচ ছাড়া মাছভাজা মুখে রোচে না’।

সন্ধ্যায় এক বাজারে এসে আমাদের নৌকা থামল। প্রকান্ড এক বটগাছ নদীর পাড়ে মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে আছে। বহমান স্রোত তার পাদদেশ অবিরাম ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। চঞ্চল জল মৃদু কলকল শব্দ তুলে শেকড়ের আনাগলি কানাগলিতে যেন লুকোচুরি খেলছে। এই চঞ্চলতার প্রতি বৃক্ষরাজের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য নিয়ে সে তার ঝাকড়া পাতাবাহার মেলে উদাস চোখে দিগন্তের পানে চেয়ে আছে। শান্ত সমাহিত।

এটি বিখ্যাত কাশিমপুরের বাজার। এখানেই আমাদের রাত্রিবাস। বাবা বললেন- এর পরেই বিরুলিয়ার চক- এত বড় বিল যে এক পাড় থেকে আরেক পাড় দেখা যায় না। রাত্রিবেলা এই চকে নৌকা বাওয়া নিরাপদ না, ডাকাতের উপদ্রব। আগামীকাল বেলা উঠলে নৌকা ছাড়া হবে। কয়েকটি নৌকা একসংগে দল বেঁধে যাবে। একা গেলে দিনের বেলায়ও ডাকাতের ভয় আছে।

ঘাটে অনেক নৌকা ভিড়ে আছে, প্রতিটি নৌকায় হারিকেন জ্বলছে। টিমটিমে সেই আলো নদীর জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে এক অপরূপ আলো-আধারির সৃষ্টি করেছে। নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, জলে আলোর নাঁচানাঁচি, বিলের দিক থেকে ভেসে আসা বাঁধনহীন বাতাস, বাজারের ভেঙে যাওয়া কলরোল- সব মিলেমিশে এক স্বপ্নের আবহ যেন। ভাবী বললেন- ‘ঘুম পাইতেছে ? আস, বিছানা পাইতা দেই’।

- ‘না, আমি বাবার লগে ঘুমামু’। আমি বললাম।

- ‘সেকি, তুমি বাবার সাথে ঘুমাইলে একলা একলা আমি ভয় পামু না’?

ভাবীর মুখে হাসি। স্নেহময় তরুন মুখের হাসি দশ বছরের বালকটিকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল। নদীর মৃদু দুলুনিতে বাজার থেকে ভেসে আসা টুকরো কথার ভীড়ে এক যুবতী নারীর উষ্ণ কোমল বুকে শুয়ে বালকটি এক স্বর্গের দেশে চলে গিয়েছিল সেদিন। উত্তর জীবনের অজস্র সুখস্মৃতির মাঝে বাল্যকালের একটি রাত ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে তার মনের আকাশে।

পরের দিন অপরাহ্নে সদরঘাট গিয়ে ভিড়ল আমাদের নৌকা। এই ঢাকা ! এইটা সদরঘাট !!

অজস্র নৌকা, দু’চারটা লঞ্চ, তীরে গাছপালার ফাকে উচু উচু দালান। মানুষের ভীড় হাকাহাকিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

বাবা এসে বললেন- ‘বউমা নাম। টমটম ঠিক করলাম। রিক্সার চাইতে টমটম ভাল অইব, সবাই একসাথে যাওন যাইব’। বোচকা-বোচকি নিয়ে সবাই গাড়ীতে উঠলাম, ঘোড়ার গাড়ী। ঢাকায় সব বাঁধানো রাস্তা, চারপাশে কত দোকাটপাট, মানুষজন। কালিয়াকৈরের বাজারে এত সুন্দর রাস্তা নাই- ভাবলাম আমি।

পপ্ পপ্ শব্দে পেছনে ফিরে তাকাই। একটা ছোটখাট টিনের ঘর ছুটে আসছে, চাক্কা লাগানো ঘর। একজন লোক ঘরের বেড়ার মধ্যে থাপড় মারছে আর চেচাচ্ছে। এটাই বাস ! আরিব্বাপস ! কী জোরেই না যায়, এই বুঝি সামনের রিক্সাটির উপরে উঠে গেল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু না, দিব্বী পাশ কাটিয়ে চলে গেল ! ভেতরে বহু লোক বসা। আহ্, কী আরাম, চড়তে পারলে জীবন স্বার্থক। বাবাকে বললাম- ‘বাবা, বাসে যাওন যায় না’?

- ‘চড়ামু চড়ামু, কাইল চড়ামু। অখন চুপ কইরা বইসা দ্যাখ্’।

অনেক রাস্তাঘাট ঘুরে যে জায়গায় এসে আমাদের ঘোড়ার গাড়ী থামল সেটার নাম হাতিরপুল। হাতিরপুলে ভাবীদের বাসা। এতকাল হাতিরপুল সম্পর্কে এত গল্প শুনেছি যে হাতিরপুল দেখার পর আমার সব স্বপ্ন ভেংগে চুরমার হয়ে গেল !

চারিদিকে ঝোপঝাড়, দিনের বেলাতেও শিয়াল ডাকে। এক জায়গায় কয়েকটা দোকানপাট, বাজারের মতো। কয়েকজন লোক ঝুড়িতে করে মাছ তরকারি নিয়ে বসে আছে। দালানকোঠা নাই বললেই

চলে। ভাবীদের ঘরও একটা টিনের দোচালা, বাঁশের বেড়া। এটা কোন শহর হলো, এই রকম এটা জায়গা নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে কী গল্প করা যায় ?
একটা প্রচন্ড 'কূ উ উ' শব্দে বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল, কানের পর্দ্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। ভাবী বললেন- 'রেলগাড়ী আসতাছে'।
সর্বনাশ, জলজ্যান্ত একটা রেলগাড়ী আসছে ! উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। 'ওকি, কই যাও, রিক্সার তলে পড়বা'- বলে ভাবী চেচিয়ে উঠলেন। কিন্তু কার কথা কে শুনে ? আমি ততক্ষনে এক দৌড়ে রেললাইনের ধারে।
উটের পিঠের মতো একটা পুল, তার নীচ দিয়ে রেললাইন। পাশেই অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দালান, সেখান থেকে অনবরত বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। বিষয়টা কী, ওখানে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি। আমার প্রশ্নের জবাবে কাঞ্চনী বলল- 'ওডা পাওয়ার হাউজ। ঐখান থেইকা ঢাকা শহরের সব ইলেকটারির বাতি জ্বলে'।
আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। মাটি কাঁপানো গমগম শব্দ করে বিশাল এক অজগর সাপ আস্তে আস্তে রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। সামনের চুঙ্গা দিয়ে গলগল করে ধুয়া বেরুচ্ছে, মুখে 'কূউউ' শব্দ। চিত্রার্পিতের মতো দাড়িয়ে থাকলাম। মহাশক্তিধর সেই অজগর হাজার হাজার লোক পেটের ভেতর নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে আসল, তারপর কোন সুদূরে হারিয়ে গেল। কী বিপুল তার শক্তি, কী প্রচন্ড তার তেজ ! ঝিকঝিক ঝিকঝিক শব্দ তুলে সে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। আজকের দিনে এমন একটা রেলগাড়ীতে চড়ে উধাও হয়ে যাওয়ার মতো সুখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না- দীর্ঘ্যশ্বাস ছেড়ে ভাবলাম আমি।

পরদিন সকালবেলা আমাকে নিয়ে বেরুলেন বাবা। অনেক আনাগলি কানাগলি পার হয়ে বিশাল একটা দালানের সামনে আমাদের রিক্সা থামল। দালান তো না, যেন রাজপ্রাসাদ। থামগুলো কী মোটা, কী উচু।
একটা আমগাছের নীচে দাড়িয়ে বাবা বললেন- 'এইডা জগন্নাথ কলেজ। তুমি এইখানে খাড়াইয়া থাক। কিছুক্ষন পরে ফখর আইব, তার সাথে যাইও। আমি অই কাচারিতে গেলাম..'।
বলে হাত তুলে পাশেই আর একটা দালান দেখালেন তিনি, ওটা কাচারি।
বাবা চলে গেলেন, আমি ফখর ভাইর অপেক্ষায় দাড়িয়ে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষন কেটে গেল। অনেক ছেলে বইখাতা হাতে ঢুকছে, কেউ বা বেরুচ্ছে। কিন্তু ফখর ভাইর দেখা নাই।
কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। যদি ফখর ভাই না আসেন তা'হলে আমার কী হবে ? বাবাকে কীভাবে খুজে বের করব, হাতিরপুলেই বা কীভাবে ফিরে যাব ? পয়সা ছাড়া রিক্সাওয়ালা নেবে না। এই বিশাল ঢাকা শহরে আমি কি হারিয়ে যাব ?
কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার চারপাশে ভিড় জমে গেল। আমার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে হয়তো তাদের মনে কৌতুহলের সঞ্চার হয়েছে। সবাই প্রশ্ন করছে- 'খোকা, তুমি কাঁদছ কেন ? কার সাথে এসেছ তুমি, কাকে খুঁজছ'?
কোনমতে বললাম যে আমি আমার বড়ভাইর খোজে এসেছি, তিনি এই কলেজে বিএ পড়েন।
- 'ফখরুদ্দিন, বিএ পড়ে ? কোন ইয়ারে'?
ইয়ার ফিয়ারের আমি কি বুঝি। একটা চশমা পড়া ছেলে চেচিয়ে বলল- 'এই শাহীন, তগো ক্লাশে ফখরুদ্দিন নামে কেউ পড়ে, চিনস্ ? এই ছেলেটি তার ভাই, এখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে কাঁদছে'।
- 'ফখরুদ্দিন ? নাতো, আচ্ছা দাড়া আমি অফিসে খোজ নিচ্ছি'। ছেলেটি চলে গেল।
এমন সময়। আহ্, ঐ তো ফখর ভাই সিড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। যাক্ বাঁচা গেল, আর ভয় নাই। আমি এক দৌড়ে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।
ফখর ভাই ভীড়ের কাছে এসে দাড়ালেন, আমার উপর চোখ পড়ল তার। আমি ভাই বলে চেচিয়ে উঠতে গেলাম; কিন্তু তার উপর চোখ পড়তেই আমার সমস্ত উচ্ছাস এক মুহূর্তে নিবে গেল। তিনি আমার উপর থেকে তার চোখ সরিয়ে নিয়েছেন, আমাকে তিনি চেনেন এমন কোন আভাস সেই চোখে নাই। আমাকে পেছনে ফেলে তিনি গটগট করে গেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন !

ব্যাপারটা কী, ভাই কি আমাকে চিনতে পারেন নাই ? ওনি কি ফখর ভাই নন্ ? তাই বা কী করে হয়, আমার ভাইকে আমি চিনতে পারব না ? আমি কি এতই বোকা ?

হঠাৎ করেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। বুঝতে পারলাম- ভাই আমাকে ঠিকই দেখেছেন, ঠিকই চিনেছেন। আমার নিতান্ত গেয়ো পোষাক-আশাক দেখে তিনি লজ্জা পেয়েছেন, তাই আমাকে না চেনার ভান করে চলে গেলেন।

আমার পরণে হাফ-প্যান্ট, গায়ে ছ্যাতাপড়া পাঞ্জাবি। গলায় কমদামী চাদর জড়ানো, খালি পা। এমন একটি অমার্জিত চেহারা জগন্নাথ কলেজে বিএ পড়া একজন উজ্জ্বল ছাত্রের ভাই হয় কী করে ?

মনটা ছোট হয়ে গেলেও বিচারবুদ্ধি হারাইনি। ভাই আমাকে না চিনলেও আমার তো তাকে হারানো চলে না। তাকে হারালে ঢাকা শহরের নির্বান্ধব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরতে হবে আমাকে। সুতরাং সমবেত ছাত্রদের ব্যুহ ভেদ করে ভাইয়ের পেছনে ছুটলাম। পেছনে রব উঠল- 'একি, কই যাচ্ছ, দাড়াও, তোমার ভাইয়ের...'।

কে কার কথা শুনে ? আমি ততক্ষনে গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়েছি, সামনেই ফখর ভাই, তাকে ধরতে হবে। একটা ছোট গলিতে ঢুকে ভাই ঘুরে দাড়ালেন। আমি তার সামনে দাড়িয়ে হাপাচ্ছি। তিনি চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন- 'তুই কার সাথে আইলি'?

আমাকে নিয়ে তিনি একটি দোকানে ঢুকলেন। সাদা ধবধবে এক জোড়া কাপড়ের জুতো কিনলেন আমার জন্যে। এমন সুন্দর জুতো, পায়ে দিতে মায়া লাগে।

বললাম- 'হাতে কইরা নেই'?

- 'কেন'? ধমকে উঠলেন তিনি।
- 'ময়লা অইয়া যাইব'।
- 'দুর বোকা, ঢাকা শহরে খালি পায়ে হাটতে নাই। বাবার তো আক্কেল পছন্দ নাই, এইভাবে খালি পায়ে কাউকে কলেজে নিয়া আসে'?

তারপর বললেন- 'চল্ তরে কামান দেখাইয়া আনি, সদরঘাটের কামান। কামান দেইখা বাসে চইড়া ফরাসগঞ্জ যামু'।

অবশেষে আমার স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছিল। মুড়ির টিনের মতো লক্কর মার্কা গাড়ীতে চড়েও বালকমন যে আনন্দ আহরণ করতে পারে, সর্বাধুনিক স্পেশশিপে চেপে নভোযাত্রীরা সেই আনন্দের দেখা পায় কি ? পরবর্তীতে সাগরমেখলা পৃথিবীর পথেপ্রান্তরে অনেক ঘুরেছি, পিরামিডের তলায় বসে ধ্যানমগ্ন হয়েছি, পুষ্পক রথে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছি। কিন্তু জীবনের প্রথম বেলায় ভাইয়ের হাত ধরে ডিজেল চালিত মুড়ির টিনের কাঠের বেঞ্চিতে বসে যে আনন্দযাত্রা শুরু হয়েছিল, তার স্মৃতি এখনও রক্তের কোষে কোষে আনন্দের অনুরনন জাগায়। সে যাত্রা এখনও শেষ হয়নি, তা চলতেই থাকে আজীবন।

মেজবাহউদ্দিন জওহের

মে-২০০৫